সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

Vol. 50 | No. 2-3 | 2013

Check for updates

দেশভাগ ও হাসান আজিজুল হকের গল্প

Volume	50
Issue	2-3
Year	2013
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	মো. জফির উদ্দিন
Published online	June 1, 2013
DOI	10.62328/sp.v50i2-3.10
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v50i2-3.10
Pages	১৭৫-১৮৫
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

দেশভাগ ও হাসান আজিজুল হকের গল্প

Check for updates

মো. জফির উদ্দিন*

উনিশশো সাতচল্লিশের দেশবিভাগ ভারত-ইতিহাসের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা। সম্পূর্ণ রাজনৈতিক ও শ্রেণিস্বার্থের উদ্দেশ্যে সংঘটিত এই দেশবিভাগ মানবেতিহাসের এক ট্রাজিক অধ্যায়ও। কেননা, ভারত-ইতিহাসে কেন, বিশ্বের ইতিহাসেও দেশভাগজনিত মানুষের এত বড় দেশত্যাগ/দেশান্তর, উদ্বাস্তুজীবনের ঘটনা ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা আর ঘটেনি। দেশভাগের পরও দু-দেশের মানুষ সেই ক্ষত বয়ে বেড়াচ্ছে আজও। ভারতের পশ্চিম অংশের মতো পূর্বাঞ্চলের বাংলাভাগের ফলে গণমানুষের যে স্বপ্নভঙ্গ হয়েছিল, মানুষ যে ভয়াবহ পরিস্থিতি ও যন্ত্রণার মুখোমুখি হয়েছিল তার সৃষ্টিশীল নির্মাণ হয়ে আসছে সাহিত্যে, চলচ্চিত্রে ও শিল্পকলায়। দেশভাগের অভিঘাতে এই মানবিক ট্র্যাজেডি হাসান আজিজুল হকের গল্পে কীভাবে রূপায়িত হয়েছে বর্তমান প্রবন্ধে তারই অনুসন্ধান করা হয়েছে।

সিরিল রেডক্লিফের ব্যক্তিগত চিঠি ও সাক্ষাৎকার থেকে উদ্ধৃতি নিয়ে আলোচনায় প্রবেশ করা যায়। রেডক্লিফ অকপটে জানাচ্ছেন যে,

> Nobody in India will love me for the award about the Punjab and Bengal and there will be roughly 80 million people with a grievance who will begin looking for me. I do not want them to find me. I have worked and travelled and sweated...oh, I have sweated the whole time. ...
> Yes, on my arrival I told all political leaders that the time at my disposal was very short. But all leaders like Jinnah, Nehru and Patel told me that they wanted a line before or on 15th August. So I drew them a line!' (উর্বশী, ১৯৯৮ : ৮৬)

দেশীয় স্বার্থান্বেষী দুই শক্তির সঙ্গে ঔপনিবেশিক তৃতীয় শক্তির রাজনৈতিক আঁতাতটি রেডক্লিফ-রোয়েদাদের মাধ্যমে কার্যকর হলো। অর্থাৎ বাংলা ভাগ হলো! রেডক্লিফ তার কৃতকর্মকে অনুধাবন করতে পেরেছিলেন, পরে অনুশোচনা জন্ম নিয়েছিল তার মনের ভেতরে। অন্তত উপর্যুক্ত মন্তব্য দুটিতে তা প্রতিফলিত যে, দেশভাগের ফলে যে-সব মানুষ ভয়াবহ পরিস্থিতি ও যন্ত্রণার মুখোমুখি হয়েছিলেন, পাল্টে গিয়েছিল তাদের জীবন চিরতরে। আবার এও এক বড় প্রমাণ যে, ক্ষমতার অপব্যবহারে কতিপয় ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর ব্যক্তিগত ইচ্ছায় কীভাবে বৃহৎ জনজাতির ভাগ্য নির্ধারিত ও বিড়ম্বিত হয়। নিঃসন্দেহে আধুনিক ভারতের সবচেয়ে বড় ঘটনা এই দেশভাগ। উপমহাদেশের বুকে এত বড় মানবিক ট্র্যাজেডি আর ঘটেনি, আর সীমান্তের দুই দিকেই উনিশশো সাতচল্লিশের অভিঘাত আমরা সমাজ-রাজনীতিতে প্রত্যহ বয়ে বেড়াচ্ছি, কোথাও ধ্বংসের মধ্য দিয়ে, কোথাও নির্মাণের মধ্যেই। (দ্র. সেমন্তী, ২০০৮ : ১০)

---

* সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট।

ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান ঘটিয়ে যে স্বাধীনতা আসে তা বাংলার মানুষের আবেগকে রঞ্জিত করতে না পারলেও ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গায় হাতকে রক্তাক্ত ও কলঙ্কিত করতে পেরেছিল। তাই স্বার্থবাদীদের বুলিতে ব্যাপারটি 'স্বাধীনতা' হলেও আমজনতার কাছে তা 'পার্টিশন' বা 'দেশভাগ' বলে চিহ্নিত। বাংলাভাগের পূর্বাপর সংঘটিত হয় নৃশংস নারকীয় হত্যাযজ্ঞ—হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা। আবার ইতিহাসের বৃহত্তম দেশত্যাগও সংঘটিত হয়—লক্ষ লক্ষ মানুষ বসতবাটি ত্যাগ করে উদ্বাস্তু ও দেশান্তরী হয়। দেশভাগের ফলে পূর্বাঞ্চলে জন-বিনিময় না ঘটলেও জন-উৎপাদন শুরু হলো বড়ভাবে। পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার থেকে উদ্বাস্তু মুসলমানরা আসতে শুরু করলেন পূর্ববঙ্গে এবং পূর্ববঙ্গ থেকে শুরু হলো হিন্দু-সম্প্রদায়ের দেশত্যাগ, বিশেষত সামর্থ্যবান পেশাজীবী হিন্দু শিক্ষিতসমাজ, যাদের সঙ্গে কলকাতা মহানগরীর পূর্বতন যোগসূত্র ছিল, তারা অনেকেই দেশত্যাগ করাটা সমীচীন বিবেচনা করলেন। সাতচল্লিশে যে দেশত্যাগের সূচনা তা বাংলাদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা ও আসামের জনগঠন বা ডেমোগ্রাফি অস্বাভাবিকভাবে আমূল পাল্টে দিয়েছে এবং এই পরিবর্তন দাবি করে নানামুখী পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ। এমনি বিশাল মাপের কোনো ট্রাজেডি যে ঘটতে পারে সেটা দেশভাগ নিয়ে ব্যস্ত ত্রিপক্ষীয় নেতৃত্বের কারও বিবেচনাতেই ছিল না। তৎকালীন রাজনৈতিক নেতৃত্বের অদূরদর্শিতার সবচেয়ে বড় নজির হয়ে আছে উপমহাদেশের পূর্বাঞ্চলের মানুষের জীবনের এই চরম দুঃখভোগ ও লাঞ্ছনা। তবে বাংলায় দেশত্যাগ বড়ভাবে শুরু হলো ১৯৫০ সালের ভয়াবহ দাঙ্গার মধ্য দিয়ে। কলকাতা, নোয়াখালি ও বিহারের দাঙ্গার অভিজ্ঞতা পেছনে ঠেলে সম্প্রীতির অন্বেষায় বিভাজিত হয়েছিল দেশ, কিন্তু দেশভাগ হয়ে উঠল আরো ব্যাপক রক্তপাত ও হিংস্রতার উৎসভূমি, মানবিক ট্রাজেডির নিরিখে দেশভাগের আগের চেয়ে নিষ্ঠুর হয়ে উঠল পরবর্তী বাস্তবতা। (দ্র. মফিদুল, ২০০৯ : ৪৩)

দেশভাগের পূর্বাপর বাস্তবতা নিয়ে সাহিত্যসৃষ্টিতে এক ধরনের নীরবতা লক্ষ করা যায়। এই নীরবতা পশ্চিম বাংলার তুলনায় বাংলাদেশে আবার বেশি। দেশভাগের সাহিত্যিক নীরবতা নিয়ে দেবেশ রায়, অশ্রুকুমার সিকদার ও হাসান আজিজুল হকসহ বিভিন্ন সমালোচক প্রশ্ন তুলেছেন বারবার। দেশভাগ নিয়ে রচিত আখ্যান প্রসঙ্গে দেবেশ রায়ের উক্তিটি স্মরণযোগ্য যে, 'বোধের স্পষ্টতা ছাড়া দেশভাগ স্বাধীনতার আখ্যান তৈরি করা অসম্ভব।' থিওডোর আডোর্নোর একটি উক্তি অমরত্ব লাভ করেছে : আউশ্‌উইৎস-এর নরমেধযজ্ঞের পর কবিতা লেখা বর্বরতা—এমনকি আউশ্‌উইৎস সম্পর্কেও। হিরোশিমা, নাগাসাকি ও হলোকস্টের অভিজ্ঞতার মতো দেশভাগের অভিজ্ঞতাও মর্মন্তুদ ও হিংস্রতাপূর্ণ। দেবেশ রায় দেখিয়েছেন, কোনো কোনো সময় এমনও আসে শিল্প-সাহিত্যেও এক একটি ফর্মে, যখন সেই ফর্ম তার দুটিমাত্র হাতকেও গুটিয়ে ফেলে তার সময়কে প্রত্যাখ্যান করতে। (দ্র. দেবেশ, ১৯৯৯ : ২৮) অশ্রুকুমারও সমর্থন করেছেন একে লেখকের নৈতিক ও নন্দনতাত্ত্বিক কারণ দেখিয়ে। কমলাবেন পটেল তার গুজরাটি স্মৃতিকথায় লিখেছেন, দেশভাগের হিংস্র বীভৎসতা তাণ্ডবনৃত্যের তুল্য। মৃদুলা সারাভাইয়ের সহযোগিনী হিসেবে এই বীভৎসতা প্রত্যক্ষ করে নিজেকেই তিনি প্রশ্ন করেছেন, এ নিয়ে কি লেখা যায়? কেন লিখব আমি? সেই তীব্র বিবমিষাময় দিনগুলির কথা স্মরণ করলেই

মানসিক ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যায়। তেমনভাবে দেখি দেশভাগের সময়কে প্রত্যাখ্যান করেছিল কথাসাহিত্যের ফর্ম। তার চেয়ে বরং স্মৃতিকথামূলক রচনায় দেশভাগ নির্মিত হয়েছে বাস্তবতার ঘনিষ্ঠ নন্দন হয়ে। অন্তত তপন রায়চৌধুরী ও মিহির সেনগুপ্তসহ অন্যান্যের রচনা তা প্রমাণ করে। প্রসঙ্গক্রমে মিহির সেনগুপ্ত তো স্পষ্টত বলেই দিয়েছেন,

> এ এক অভিশাপমুখর সময় সম্ভবত, যখন লোকশিল্পীরা পর্যন্ত এর চিত্র, সুর, কথকতা বা কোনোকিছুই ধরে রাখার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন না, অথবা তার ফুরসতও পান না। বোধহয় তখন একদিকে লোভের লুণ্ঠন, আরেকদিকে আতঙ্কের পলায়নই শুধু ছবি। কিন্তু হায়! এ-রকম ছবিতে কি কোনও শিল্পী মাতৃবর্ণ দেখে? অথবা কোনও লোকশিল্পী কি কোনও সুরের বুনোট করতে পারে? এ যে স্বদেহ কণ্ডূয়ণ করে পায়ের আঙুল থেকে শুরু করে স্বদেহ ভক্ষণের চিত্র। এ নিয়ে কিছু সৃজন করা তো—অবক্ষয় নিয়ে নির্মাণ। অবক্ষয়ের রূপকল্প কি জীবনধর্মী শিল্পীরা করতে পারেন? (মিহির, ২০০৬ : ৩০২)

এর উত্তর হাঁ বা না—দুটোই হতে পারে। পাউল সেলান বলেছিলেন, সবকিছু যখন ধ্বস্ত হয়ে যায় তখনও বেঁচে থাকে ভাষা। সেই ভাষা দিয়েই হলোকস্টের নির্মমতাকে রূপায়িত করেছেন এনি হ্বিজেল, প্রিমো লেভি ও পাউল সেলানের মতো লেখকেরা। সেলানের সবচেয়ে বিখ্যাত কবিতাটির বিষয়বস্তু ইহুদি নিধনযজ্ঞ : মৃত্যুশিবিরের কমান্ড্যান্ট শিবিরে বন্দি জিপসিদের বাধ্য করে একটি সংগীতদল গড়ে তুলতে। তাদেরকে ট্যাঙ্গো বাজাতে বলা হয় যখন সারি সারি বন্দি গ্যাস চেম্বারে হেঁটে ঢুকবে। সবশেষে ওই দলের ভাগ্যেও একই পরিণতি ঘটে, যদিও তাদের যাত্রাকালে সংগীত বাজানোর জন্য সম্ভবত কেউ অবশিষ্ট ছিল না। নিঃসন্দেহ পরাবাস্তব দৃশ্য এটি। সেলান বর্ণনা করেছেন আপাত দুর্বোধ্য ভাষায়, কিন্তু তা ছিল দুর্মরভাবে প্রকাশক্ষম ও স্পন্দিত। তিনি যা চেয়েছিলেন তা হলো, নির্বাকতায় দীর্ঘ প্রান্তর পেরিয়ে নীরবতার অন্য প্রান্তে ফুঁড়ে বেরুনো। (সেলান, ১৯৯৭ : ৮) দেশভাগের প্রশ্নে এই নীরবতার অন্য প্রান্তে ফুঁড়ে বেরুনোটা ছিল হাসান আজিজুল হকেরও একটি দায়। কেননা তার ভেতরে অন্তঃসলিলা দুঃখবোধ ছিল দেশভাগকেন্দ্রিক কথাসাহিত্য নিয়ে। যাকে বিষয় করে মহৎ সাহিত্যসৃষ্টি হতে পারত অথচ হলো না। হাসান এর প্রেক্ষণবিন্দু হিসেবে দেখেছেন লেখকদের মধ্যবিত্তসুলভ মানসিকতাকে। এই মধ্যবিত্ত শ্রেণিটাই ছিল দেশভাগ ও স্বাধীনতায় খুবই উৎসাহী। যাদের শ্রেণিস্বার্থের যূপকাষ্ঠে বলি হতে হয়েছিল আপামর জনতাকে। হাসানের ভাষায়, পাকিস্তান সৃষ্টির পর চাকরি-বাকরিতে নিযুক্ত ভাগ্যান্বেষী মধ্যশ্রেণির বাইরে ক'জন চাষী ও কৃষক স্বেচ্ছায় আপন বাসভূমি ত্যাগ করে দেশবদল করেছে তা আঙুলে গোনা যায়। তবুও তো দেশত্যাগী সংখ্যাহীন! খোঁজ করলে দেখা যাবে, যে-অসংখ্য সাধারণ মানুষ দেশত্যাগ করেছে তার প্রায় সবই স্বার্থান্বেষীদের সৃষ্ট এক একটি দাঙ্গার ধাক্কায় এবং দূষিত ও উদ্দেশ্যমূলক রাজনীতির প্রভাবেই তা করেছে।...অথচ এটা ঠিক যে পাকিস্তান সৃষ্টির ফলে মুসলমান মধ্যবিত্তের যে ছিটেফোঁটা লাভ হয়েছিল তার তুলনায় সাধারণ মানুষকে অসহ্য ভোগান্তি ও নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছে। দেশবিভাগের পরে যে-হৃদয় বিদারক মানববিপর্যয় ঘটেছে তা নিয়ে কোনো ঔপন্যাসিকই লিখলেন না। স্বাভাবিকভাবে নয়, উদ্দেশ্যমূলক প্ররোচনা, সময়সঞ্চিত কুসংস্কার ও গোঁড়ামির ফলেই পাকিস্তান আন্দোলনে যাদের সমর্থন

হাতেকলমে দেখানো সম্ভব হয়েছে, অস্বাভাবিক রাজনৈতিক প্রচারের দ্বারা যাদের দিয়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ঘটানো হয়েছে অথচ যারা কখনোই কোনো কারণেই দেশত্যাগ করবে না, দেশত্যাগের কল্পনা পর্যন্ত যাদের মাথায় আসেনি, তাদের যখন হাজারে হাজারে লাখে লাখে ভিটে-মাটি থেকে উৎখাত হয়ে ছিন্নমূল উদ্বাস্তুতে পরিণত হতে হয়েছে—আমাদের সাম্প্রতিক ইতিহাসের সেই বৃহত্তম বেদনা ও যন্ত্রণার কথা প্রত্যাশিত সংখ্যায় লেখা হলো না। (হাসান, ১৯৯৪ : ১৩, ১৬)

হাসান যে বৃহত্তম বেদনা ও যন্ত্রণার কথা উল্লেখ করলেন বাংলাদেশের সাহিত্যিকেদের বেশির ভাগের বাস্তব অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে তা অনুভব করার সুযোগ ছিল না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর সাহিত্যের ক্ষেত্রে দেখা গেছে মৃত্যুবিভীষিকার অভিজ্ঞতালব্ধ লেখকদের হাতেই সৃষ্টি হয়েছে সময়ের মহৎ সাহিত্য—লেখকদের বেদনালব্ধ অভিজ্ঞতাই তাকে সামগ্রিক বোধে উত্তীর্ণ করে পোড়খাওয়া মানুষের নিয়তি উদ্‌ঘাটনে প্রয়াসী করেছে। পাউল সেলান ও ইমরে কারতেশই এর বড় উদাহরণ। ওপার বাংলাতে দেশভাগ নিয়ে এ-পর্যন্ত যে-সব আখ্যান লেখা হয়েছে তার বেশিরভাগই পূর্ববঙ্গ হতে উৎখাত বাস্তুহারাদের সৃষ্ট। একইভাবে বাংলাদেশের সাহিত্যে দেশভাগের লাঞ্ছনা, মর্মজ্বালা ও যন্ত্রণা নিয়ে যারা লিখেছেন তাদের মধ্যে হাসান আজিজুল হক, মাহমুদুল হক ও কায়েস আহমদ প্রমুখ অন্যতম। আর এদের সকলেই পশ্চিমবঙ্গ হতে বাস্তুচ্যুত দিশেহারা মানুষ। তাই দেশভাগের গ্লানি ও হলাহলে তাদের মতো নীল হতে অন্য কাউকে আমরা দেখি না। অন্তত তাদের রচিত আখ্যানে। অবশ্য এরা এ বিষয়ে লিখেছেন খুবই কম। যতটা লিখেছেন তার সবটাই তিক্ত অভিজ্ঞতার কারণে মানবীয় সংকট ও ট্রাজিক রসে সিক্ত। যে সংকট ও ট্রাজেডি মানুষের হাতেই তৈরি।

হাসানের জন্ম বর্ধমানের হিন্দু অধ্যুষিত একটি অঞ্চলে। ব্রিটিশশাসিত ঔপনিবেশিক ভারতে ন'বছর এবং স্বাধীন ভারতে সাত বছর মোট ষোলো বছর ভারতে তার অবস্থানের অভিজ্ঞতা । পরাধীন ভারতবর্ষে তেতাল্লিশের মন্বন্তর ও ধর্মকে কেন্দ্র করে বঙ্গবিভাজনের নামে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে যে ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা - যখন ঘটে তখন হাসানের বয়স কম ছিল। তাহলেও সমাজে সংখ্যালঘু হিসেবে তার অবস্থানটা তিনি ঠিকই আঁচ করতে পেরেছিলেন, আবার সর্বমানবিক সম্পর্কও তাকে আলোড়িত করেছে বালক বয়সেই। সেই বয়সেই মর্মান্তিক দু-একটা ঘটনার আবহ ও স্মৃতি তাকে আজও বহন করতে হচ্ছে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দেশভাগ, দেশত্যাগ ইত্যাদি তার বালক বয়সের অবছা স্মৃতি হয়ত, কিন্তু তা-ই তাকে লেখক হয়ে ওঠার ভিত হিসেবে কাজ করেছে। তার নিজের জবানিতে, 'কিন্তু আমাকে স্বীকার করতে হবে, এসব বিষয়ে আমার যা কিছু জ্ঞান সবই পরেকার—সাত-আট বছরের বালক কীই বা জানতে পারে। কিন্তু সাত-আট বছরের বালকের স্মৃতি মিথ্যে বলবে না এবং অন্তত আমার কাছে তা মূল্যবান।' (হাসান, ২০০২ : ৭২-৭৩) এরপর হাসানদের দেশান্তর ও উদ্বাস্তুজীবন—দেশভাগের বিষবৃক্ষে সওয়ার হওয়া—'এই রকম করেই তো দেশভাগে পৌঁছে গেছি আমরা । উনিশশো চুয়ান্নে যখন প্রথম পূর্ব পাকিস্তানে যাই তখন শিয়ালদহ স্টেশনে উড়ে যাওয়া, ছিঁড়ে যাওয়া, ন্যাকড়া

হয়ে যাওয়া লক্ষ মানুষ থিক থিক করছে। তাদের মাড়িয়ে ট্রেনে উঠি, ট্রেন থেকে নেমে তাদের মাড়িয়ে কলকাতায় আসি। কলকাতা একবারও ফিরে তাকায় না।' (হাসান, ২০০২ : ৭৯) সেই স্মৃতি, বিশেষ করে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং পরবর্তীকালে উদ্বাস্তু জীবনের নানা সংকট ও স্মৃতি তাকে কঠিন অভিজ্ঞান এনে দেয় জীবন, রাজনীতি, মানুষ আর মানবতা বিষয়ে। হাসানের দীর্ঘকাল-ধরে-লেখা গল্পগুলোই তার বড় প্রমাণ। বিশেষ করে দেশভাগ ও দেশভাগের আবহ নিয়ে লেখা গল্পগুলো দুমড়ানো-মুচড়ানো মানবতার কঠিন সত্যকেই উন্মোচিত করেছে।

ভারত, পাকিস্তান ও পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া স্বাধীন বাংলাদেশে এ-পর্যন্ত অবস্থানকালে হাসান রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে স্বস্থ ও শান্ত পরিবেশ দেখার সুযোগই যে পাননি তার প্রলম্বিত জীবনের ঘটনা পর্যালোচনা করলেই বোঝা যায়। ভারতে অবস্থানকালে তার ষোল বছরের জীবনস্মৃতিতে রাজনেতিক ঝঞ্ঝা, মহাদুর্ভিক্ষের কারণে মৃত্যুবিভীষিকা, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কারণে নৃশংস হত্যাকাণ্ড, উদ্বাস্তুজীবনের দুর্মোচ্য সংকট, বিশ্বযুদ্ধের কারণে ও তার প্রতিক্রিয়ায় অর্থনেতিক জীবনে প্রবল মন্দা, কালো বাজারের রমরমে ব্যবসা, নৈতিক জীবনে দারুণ অবক্ষয়—এ-সবের কালো ছায়া তার স্মৃতিতে বার বার হানা দিয়েছে তীব্র করে। আবার পূর্ব-পাকিস্তান আসার পর সামরিক শাসনের সূত্রপাত ঘটতে দেখেন। দেখেন ধর্ম ও সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধিকে হাতিয়ার করে কীভাবে আইয়ুব খানের মতো একজন ফ্যাসিস্ট নেতা শোষণ-শাসন ও দমনপীড়নের বিচিত্র লীলা-খেলায় উন্মত্ত হয়ে ওঠেন। পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে বাঙালিদের নানা গণআন্দোলন এবং সেই গণরোষের ধারাবাহিকতায় একাত্তরের নজিরবিহীন ভয়াবহতা দেশের অভ্যন্তরে অবস্থান করেই হাসান খুব কাছে থেকেই প্রত্যক্ষ করেন। প্রত্যক্ষ করেন স্বাধীনতা-উত্তরকালে বাংলাদেশে উদ্ভূত পরিস্থিতির জটিলতা ও ভয়াবহতা। সবার ওপরে প্রত্যক্ষ করেছেন অর্বাচীন সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকার নগ্ন কূটচক্রান্ত ও লীলাখেলাকে। সব মিলিয়ে তিনি যে-সব অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন তা বহুবিচিত্র এবং লোমহর্ষক। এইসব অভিজ্ঞতাকে হাসান তার গল্পে এনেছেন এক স্বতন্ত্র ভাষারীতিতে ।

বাংলাদেশের সাহিত্যে হাসান আজিজুল হকের খ্যাতি গল্পকার হিসেবে। তাঁর গল্পের বিষয়-আশয় বিচিত্র। বিচিত্র ভাবের গল্পের মধ্যে দেশভাগকেন্দ্রিক গল্পগুলো আবার বিশিষ্ট। এই বিশিষ্টতার মূলে দাঙ্গা আর দেশভাগজনিত উদ্বাস্তুজীবনের বিপন্নতা ও যন্ত্রণার বহুরৈখিক উপস্থাপন। হাসান দাঙ্গা আর উদ্বাস্তুদের নিয়ে বেশ কটি গল্প লিখেছেন। সংখ্যাতত্ত্বের বিচারে যদিও তা একেবারেই হাতেগোনা । তাহলেও দেশ বিভাগের যূপকাষ্ঠে সাধারণ মানুষ অসহায়-আত্মসর্মপণের মধ্য দিয়ে কতভাবে বলি হয়েছে, হাসান বিভিন্ন সমস্যার সাহায্যে তা উপস্থাপন করেছেন। এ-ধরনের প্রত্যেকটি গল্পের পরিমণ্ডলে আশাভঙ্গের বেদনার কারণে রৌদ্রালোকিত জীবনের কোনো ছবি নেই, জীবন পাঁশুটে, ধূসর, বিবর্ণ মলিন—হতাশার জমাট অন্ধকারের দিকে জীবনের যাত্রা, কোনো কোনো চরিত্র যেন জীবন্ত লাশের মতো তাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে। দাঙ্গা ও উদ্বাস্তুদের নিয়ে হাসানের লেখা প্রায় প্রত্যেকটি গল্পই প্রগাঢ় ও প্রত্যক্ষ অনুভূতির কারণে রক্তাক্ত হয়ে উঠেছে। (জাফর, ১৯৯৬ : ২৩)

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় হাসানের প্রিয় লেখক। ১৯৫১ সালে প্রকাশিত মানিকের *স্বাধীনতার স্বাদ* উপন্যাসটি ছেচল্লিশের চলমান দাঙ্গার প্রেক্ষাপটে রচিত হয়েছিল । দেশবিভাগের পেছনে ত্রয়ীশক্তির ষড়যন্ত্র ও কূটকৌশল যে কত গভীর ও ব্যাপককভাবে কাজ করেছিল মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর উপন্যাসে সে-চিত্র অঙ্কন করেছেন। কেননা স্বাধীনতার তিক্ত স্বাদ সম্পর্কে মানিকের উপলব্ধির বাঙ্ময় প্রকাশ তাঁর চরিত্রের মুখ দিয়ে অমোঘ বাণীর মতো স্মরণীয় হয়ে ওঠে : 'রাজনৈতিক সংগ্রাম যে-দেশের ধর্মের লড়াইয়ে দাঁড়ায় সে দেশের বরাত বড় খারাপ। শেষপর্যন্ত কী হবে আমি জানি না কিন্তু আপনাকে বলে রাখছি, দাঙ্গা থামার পরেও দেখা যাবে হিন্দু-মুসলমান সমস্যার সমাধান হয়নি, স্বাধীনতার সমস্যা রয়ে গেছে' (গিরীনের উক্তি)। মানিক অকাল প্রয়াত হয়েছিলেন। ছেচল্লিশের দাঙ্গার পর সাতচল্লিশের 'স্তান' ও 'স্থান'-এ বিভক্ত হয়ে যারা উদ্বাস্তু পরিচয়ে দুই দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল তাদের মর্মবিদারী জ্বালা ও যন্ত্রণার কথা মানিক লিখে যেতে পারেননি। উত্তরসূরী হিসেবে হাসান মাত্র গুটিকয়েক গল্পে হলেও মানিকের সেই অপূর্ণ কাজ দক্ষতার সঙ্গে উপস্থাপন করেছেন। ধর্মকেন্দ্রিক বিভাজিত দুটি রাষ্ট্রের অদ্ভুত পরিণাম সম্পর্কে মানিক যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন হাসান তাঁর গল্পগুলোর রাজনৈতিক দিক থেকে তারই ভাবসত্য উপস্থাপন করে মানিককে মহিমান্বিতই করেছেন বলা চলে। ব্রিটিশের সঙ্গে আপসের মাধ্যমে অর্জিত স্বাধীনতা প্রসঙ্গে হাসানের বিবেচনাও মানিকের সঙ্গে সংহতি প্রকাশক, 'বিজয় শব্দে নয়, গোঙানির আওয়াজ নিয়ে এসেছে মহাদেশের স্বাধীনতা। ...ম্যাড়মেড়ে ভারতবর্ষে স্বাধীনতার আলো কুষ্ঠে ক্ষতের উপরে খেলা করেছে।' দাঙ্গা ও দেশভাগের ব্যাপারটা যে ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে কংগ্রেস ও লিগের উচ্চ পর্যায়ের স্বার্থবাদী শ্রেণির যোগসাজশ ও আপসের ফলেই সংঘটিত হয়েছিল এবং এই বিভাজন প্রক্রিয়ার সঙ্গে দেশের বৃহত্তর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর স্বার্থ যে কোনোভাবেই জড়িত ছিল না উক্তিটিতে তা-ই প্রতিফলিত হয়েছে। অন্যদিকে স্বাধীনতার সুফল যাতে সাধারণ জনগোষ্ঠীর হাতে না যায় তার জন্যেই ব্রিটিশের সঙ্গে লিগ-কংগ্রেসের এই অশুভ আঁতাত বা আপস। আর সেই আপসের বিষময় ফল হচ্ছে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, যে দাঙ্গার মূলে ছিল ধর্মীয় ভেদবুদ্ধির উস্কানি। সাধারণ জনগোষ্ঠী এই উস্কানির শিকার হয়েছিল এ-ব্যাপারে হাসান নিঃসংশয়। হাসানের গল্পগুলোতে এর বাস্তব প্রতিফলন আমরা দেখতে পাই তার সৎ ও নিষ্ঠ অবস্থানের গুণে। আবার দাঙ্গাকবলিত মানুষ সাতপুরুষের ভিটেমাটি থেকে উৎসাদিত হয়ে নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে কিভাবে পাকিস্তান থেকে হিন্দুস্থান এবং হিন্দুস্থান থেকে পাকিস্তানে ছুটোছুটি করেছে হাসান তা প্রত্যক্ষ করেছেন খুব কাছ থেকে। তিনি এবং তার বাবা-মা পরিবারের অন্যান্য সদস্যকে নিয়ে পাকিস্তানে আশ্রয় নিয়েছিলেন; সুতরাং উদ্বাস্তু জীবনের যে মর্মযন্ত্রণা সেটা যে কতখানি অন্তর্দেশবিদারী হতে পারে তার অভিজ্ঞতা তাকে কল্পনার মাধ্যমে পেতে হয়নি। পেয়েছিলেন নিজের জীবনের দারুণ দুঃখকষ্ট ও অন্তর্দাহের মাধ্যমে। ফলে গল্পগুলোতে লক্ষ করা যায় সুগভীর পর্যবেক্ষণ ও প্রগাঢ় উপলব্ধি। একটা বক্তৃতায় হাসান যদিও বলেছেন, 'স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ লক্ষ মানুষ ভারত-ইতিহাসের ভয়াবহতম মানব বিপর্যয়ের মুখে পড়ল। যার কোনো বর্ণনাা নেই বর্ণনা হয় না। সাহিত্য সেই বিশাল ভূমিকম্পের সম্মুখীন হতেও যেন শিউরে ওঠে।' যতই অবর্ণনীয় হোক শিল্পীকে

তার দুঃস্বপ্নের ভাষাটাও বিনির্মাণ করতে হয়ে। কেননা পরিস্থিতিতে 'ভাষাহীনতা' অর্থ 'surrender to cynicism'। একজন শিল্পী হিসেবে হাসানকে তাই ঘুরে দাঁড়াতে হয়। তার গল্পগুলো প্রকৃত অর্থে ঘুরে দাঁড়ানোরই গল্প।

ছিন্নমূল উদ্বাস্তু মানুষ যখন সীমান্ত পেরিয়ে অন্যদেশে নিরাপত্তার সন্ধানে চলে যায়, তখন তারা 'remain suspended, hanging between the two worlds'—একদিকে স্মৃতির মধ্যে থেকে যায় ছেড়ে আসা অতীত, অন্যদিকে বর্তমানে তাকে নতুন করে গড়ে তুলতে হয় জীবন। বিশুদ্ধ বাঁচার মৌলিক তাগিদে তাকে ব্যাপৃত থাকতে হয়। (অশ্রুকুমার, ২০০৮ : ২০৫) হাসানের দেশভাগের গল্পে এ শাশ্বত সত্য বাঙ্ময় ভাষায় প্রতিরূপ পেয়েছে। প্রথম গল্পগ্রন্থ *সমুদ্রের স্বপ্ন, শীতের অরণ্য* (১৯৬৪)-এর 'উত্তর বসন্ত'টি দেশভাগ-সংক্রান্ত উদ্বাস্তু জীবনকাহিনী। পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান থেকে পূর্ববঙ্গের মফস্বল শহরে আগত মুসলমান পরিবারের গল্প এটি। যে বাড়িতে পরিবারটি উঠেছে তা অন্ধকারচ্ছন্ন ও ভূতুড়ে। বাধ্য না হলে কেউ থাকতে চায় না বাড়িটিতে। বাড়ির বৃদ্ধ কর্তা দিনের বেলাতেও মশারি খাটিয়ে হাঁটুর মধ্যে মাথাগুঁজে বসে থাকেন আর মাঝে মাঝে দাঁত খিচিয়ে চিৎকার করেন কারণে-অকারণে—'মহাপাপ করেছি, না হলে এত কষ্ট হয় আমার, মহাপাপ করেছি জীবনে, মহাপাপ করেছি, না হলে এত কষ্ট হয় আমার...।' শুধু কর্তা নন, বাড়ির প্রায় প্রত্যেকটি চরিত্র হতাশ ও অবসাদগ্রস্ত। কর্তার সঙ্গে কথোপকথনে গৃহকর্ত্রীরও আকুতি, 'বিষ তুমি খাবে কেন? আমি খাব?' এমনকি বাড়ির কলেজপড়ুয়া তরুণী বাণী, যার সঙ্গে বাইরের পৃথিবীর যোগাযোগ আছে, তারও উপলব্ধি বড় করুণ, 'বাপ-মায়ের কাছে জীবনটা জীর্ণ ন্যাকড়ার মতো বাতাসে উড়ছে। কোনো কিছুই তাদের পরিচিত আর প্রিয় নয়, ছোট ভাই দুটিও নিরানন্দ। আমরা রিফ্যুজি, উদ্বাস্তু।' মৃত বোনের প্রেমিক কবির যখন একটি সম্ভাবনা নিয়ে গৃহে এসে উপস্থিত হয় তখন বাণী বলে, 'এখন তোমাকে যেতে হবে কবীর। এ বাড়ির সবকটি মানুষ অসুস্থ।' এক পর্যায়ে বাণী কেঁদে ফেলে, 'না, আমাকে লোভী করে তুলো না। আমরা সবাই অসুস্থ। আমাদের লোভী করতে নেই। আমাদের কোনো অধিকার নেই জীবনে।' আসলে ভূতুড়ে বাড়ির অন্ধকার আর মশারির ভেতর কর্তার বসবাস এ দুটোই রূপক—উদ্বাস্তুদের কাছে পাকিস্তান সত্যিই সংকীর্ণ, বিষণ্ন, হাহাকার ও উদ্বেগ-উৎকণ্ঠাভরা দেশ। স্বদেশহারা পরবাসী মানুষের কাছে ভবিষ্যৎহীনতারও দ্যোতক। চরিত্রগুলোর মনোজগতের সংকট নিয়ে গল্পটি লিখিত আর সংকটের মূল কারণ দেশভাগের ফলে দেশত্যাগ। অন্যদিকে অন্ধকারের বিপরীতে ফেলে আসা যে 'আশ্চর্য লাল রোদের বর্ধমান শহর' বাণীকে সারাক্ষণ স্মৃতিকাতর করে রাখে, সেই স্মৃতিঘেরা স্বদেশেই যেন তাদের স্বপ্ন ফেলে এসেছে ওরা। আজ তাই তাদের কাছে জীবন এত দীর্ঘ, ক্লান্তিকর, আশাহীন ও নিরর্থক।

দ্বিতীয় গল্পগ্রন্থ *আত্মজা ও করবী গাছ* (১৯৬৭)-এর নাম গল্পটিও যেন এক নিরর্থক জীবনের গল্প। এই গল্পের কেন্দ্রে আছেন একজন বৃদ্ধ-অসহায় পিতা, যিনি নিজ মাতৃভূমি ভারত থেকে দাঙ্গায় উৎখাত হয়ে সপরিবারে ঠাঁই নিয়েছেন পাকিস্তানের এক গঞ্জ এলাকায়। একদিকে সহায়-সম্বলহীন, অন্যদিকে হাঁপানি রোগাক্রান্ত এই বুড়োর পরিবারে

জীবিকার নিরাপত্তা বলতে কিছু নেই। কিন্তু বুড়োর নিজের অস্তিত্ব যেমন রক্ষা করতে হবে, রক্ষা করতে হবে পরিবারটির অস্তিত্বও। তাই বেঁচে থাকার জন্য নিজকন্যা রুকুকে টাকার বিনিময়ে সঁপে দিতে হয় ফেকু আর সুহাসের মতো বখাটেদের হাতে। যদিও অভিনয় করতে হয় বৃদ্ধকে বিগলিত কৃতজ্ঞতায়, 'এখানে না খেয়ে মরে যেতাম তোমরা না থাকলে বাবারা।...আর কত যে ধার নিতে হবে তোমাদের কাছে। কবেই-বা শুধতে পারব এই সব টাকা?' কিন্তু ঘরের ভিতর থেকে বৃদ্ধের কানে যখন ভেসে আসে আত্মজার চাপা কান্নার শব্দ আর ফেকুদের উল্লাস, বৃদ্ধের ভেতরে তখন ক্রিয়াশীল থাকে অক্ষম ক্রোধ আর অসহ যাতনা। বৃদ্ধের উঠোনে করবীর গাছ—একদা বুড়ো তা লাগিয়েছিল বিচির জন্য অথচ করবীর বিষ পান না করেও প্রতিনিয়ত জর্জরিত হচ্ছে বুড়ো আত্মগ্লানিতে — জীবিত থেকেও অনুভব করছে প্রতিনিয়ত মৃত্যুর যন্ত্রণা। দেশত্যাগই বৃদ্ধকে করেছে এমন আত্মসম্ভ্রমহীন ও পাষণ্ড। বৃদ্ধ যেখানে বলে, 'দেশ ছেড়েছে যে তার ভেতর বাইর নেই। সব এক হয়ে গেছে।' হাসান করবী গাছকে আত্মজার রূপক হিসেবেই প্রতিস্থাপিত করেন গল্পে অথবা দেশভাগটাই আগাগোড়া হয়ে ওঠে আত্মজা ও করবী গাছের রূপক । গল্পের শেষে বৃদ্ধের কান্না তো আর থামতে চায় না, 'এ্যাহন তুমি কাঁদতিছ? এ্যাহন তুমি কাঁদতিছ? এ্যাহন কাঁদতিছ তুমি?' ইনামের পৌনঃপুনিক এই অবোধ প্রশ্ন সত্যই আমাদের লজ্জা, অপরাধ কিংবা বিদ্রূপের মুখোমুখি ঠেলে দেয়? এ প্রসঙ্গে আবু জাফরের মন্তব্য যথার্থ যে, 'উদ্বাস্তুদের জীবন যে কতো জ্বালাময়, কতো যন্ত্রণাময় হতে পারে হাসান সামান্য কয়েকটি কথার আঁচড়ে তো নয় যেন রক্তের আখরে ব্যক্ত করেছেন 'আত্মজা ও একটি করবী গাছ' গল্পে—দ্বিখণ্ডিত ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষের বিপন্নতার কথা, বিড়ম্বনার কথা ও চরম আত্মগ্লানির কথা বাংলা সাহিত্যে এমন করে কেউ লিখছেন বলে জানা নেই।' (জাফর, ১৯৯৬ : ২৩)

হাসানের একই গ্রন্থের 'পরবাসী' গল্পটি ছেষট্টি সালের দাঙ্গার প্রতিক্রিয়াজাত। গল্পটি মানুষ আর মনুষ্যত্বের অহেতুক হত্যাযজ্ঞ, প্রতিশোধপর্বের নিদারুণ এক নিরর্থকতা নিয়ে লেখা। রাঢ়ের অনক্ষর দুই ভূমিহীন দিনমজুর ওয়াজদ্দি ও বশির। দেশের দণ্ডমুণ্ডের কর্তারা যে-স্বাধীনতা এনেছেন বা সাম্প্রদায়িকতার বীজ রোপণ করেছেন সমাজদেহে তারা তার প্রায় কিছুই জানে না। তারা কোথাও কর্তা নয়, তাদের মালিকানা একটিতেই, সে শুধু ভোগান্তি। বশির খবর পেয়েছিল হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা লেগেছে। রাতেই গাঁয়ে হিন্দুরা ওদের আক্রমণ করবে। ওয়াজদ্দি ওসব কানে তোলে না। কেননা নিজের দেশের ব্যাপারে তার কোনো শঙ্কা নেই। বরং বিরক্ত হয়ে বশিরকে বলেছিল, 'তোর বাপ কটো? এ্যাঁ—কটো বাপ? মা কটো ? একটো তো? দ্যাশও তেমনি একটো। বুইলি?' সাধারণ মানুষ বলে ওয়াজদ্দির চিন্তাও এমন সহজ। কিন্তু সে রাতেই ওরা এসে 'একটা ঈগলের মতো কুৎসিত নখ দিয়ে গ্রামটাকে চেপে' ধরে। বশিরের চোখের সামনে প্রথম বলি হয় ওয়াজদ্দি। তারপর একে একে বল্লম দিয়ে গাঁথা হলো বশিরের সাত বছরের ছেলেকে, যুবতী স্ত্রী পোড়া কাঠের মতো ছাই হলো দেখতে দেখতে। এই ভয়ংকর দৃশ্য দেখে বশিরের আর্তনাদ, 'আল্লা তু যে থাকিস মানুষের দ্যাহোটার মধ্যে—কোতা, কোতা থাকিস তু, কুনখানে থাকিস বল।' এক পর্যায়ে নিরুচ্চার হাহাকারে বশির অভিজ্ঞানপ্রাপ্ত হয়, 'আমি

আর বচির নাই, বচির শ্যাষ, বচিরের হয়ে গেলচে—দ্যাশ ফ্যাশ নাই—আমি এ্যাকোন আর এক দ্যাশে জন্ম লোব।' তারপর বশির পালায়। পালাতে গিয়ে সীমান্তের ওপারে চঁদের আলোয় ধুতি পরিহিত লোকটাকে দেখতে পায়। তারপর প্রচণ্ড শক্তি দিয়ে হিন্দু লোকটিকে বশির হত্যা করে। হত্যার পূর্বমুহূর্তে জিঘাংসু বশিরের স্বগতোক্তি, 'পালাইছিলে শ্যালো ই দ্যাশ থেকে, শ্যালো।' অতঃপর বশির উল্লাস করে কিন্তু রক্তাক্ত মুখের দিকে তাকিয়ে দেখে 'সেই মুখ ঠিক যেন ওয়াজদ্দির মুখ—রক্তাক্ত বীভৎস ও তেমনি অবাক।' চোখের ওপর থেকে ধোঁয়াটে পরদাটা যেন সরে গেল আর তার চোখে পানিতে ধূসর হয়ে এলো দুটি পৃথিবী— যাকে সে ছেড়ে এলো এবং যেখানে সে যাচ্ছে। নির্মোহ বয়ানের নির্মম এই হত্যাযজ্ঞ ও যাত্রা পাঠকের মনকে যন্ত্রণাকারী জিজ্ঞাসা ও দার্শনিক ঠাঁটে প্রতিপাদ্য করে তোলে।

'মারী' গল্পটিতে বর্ণিত হয়েছে একটি মফস্বল শহরে উদ্বাস্তু আগমনের অব্যবহিত পরবর্তী পরিস্থিতি। দেশভাগের ফলে ভাগ্যবিড়ম্বিত মানুষগুলো বাস্তুচ্যুত হয়ে পরদেশে কীভাবে এখানে-ওখানে জরা ও মৃত্যু নিয়ে খড়কুটোর মতো ভাসতে থাকে তার একটি সূক্ষ্মচিত্র অঙ্কন করেছেন হাসান। সেই সঙ্গে উন্মোচিত হয়েছে মানুষের ভেতরকার ক্ষুদ্রতা ও অবক্ষয়ের রূপচিত্রও। স্কুল ঘরে একদল রিফ্যুজি আশ্রয় নিয়েছে। তাকে কেন্দ্র করে মানুষের মধ্যে নানা প্রতিক্রিয়া । কৃষক রকিব অজানা আতঙ্কে ভোগে 'আমরা মরতিছি নিজেগো জ্বালায়, এ্যাহোন রিফুজি আলি বাঁচবেন একডা লোক—কনদিকি!' কিন্তু মৌলভীর কণ্ঠে সহানুভূতি, 'ওরা যাবে কোনদিক বলবা তো?' আবার একদল লোক রিফ্যুজিদের উদ্দেশ্যে ঘড়ায় করে দুধ নিয়ে যায় লোকদেখানো বদান্যতায়; স্কুল ঘরে গিয়ে যখন শোনে তাদের আগেই সরকার রিফ্যুজিদের ভাতের ব্যবস্থা করেছে তখন তারা মনঃক্ষুণ্ন হয়। প্রথম খাদ্য সরবরাহের সর্বময় কৃতিত্বের অধিকারী হতে না পেয়ে তারা অসন্তুষ্ট হয়। এক সময় দুধ বিতরণ শেষ হয় হট্টগোলের ভেতর দিয়ে। সন্ধ্যা নামে। চারদিকে একটা গন্ধ ছড়ায়। হঠাৎ বমির উৎকট আওয়াজ ধ্বনিত হয়। দুধ বিতরণকারীদের একজন কবীর সাহেব দেখেন আধশোয়া একজন লোক বমি করছে, আর লোকটির চোখ চকচক করছে। তারপর তিনি আরও দেখলেন, 'অসংখ্য মানুষ আধশোয়া অবস্থায় বমি করছে আর তার দিকে চকচকে চোখ মেলে চেয়ে হাঁফাচ্ছে । এবং তারপরে মূক মাটির ওপর হলুদ রং এর পাখি নেচে নেচে বেড়াচ্ছে।' অনিকেত ও অসহায় মানুষের বিয়োগান্তক পরিণাম গল্পটিকে করুণ রসে সিক্ত করে দেশভাগের অপরিণামদর্শী বাস্তবতাকেই পরাবাস্তব চেতনায় ব্যঞ্জিত করে তুলেছে।

হাসানের দেশভাগের অপর গল্প *জীবন ঘষে আগুন* (১৯৭৩) গ্রন্থের 'খাঁচা' গল্পটি। দেশভাগজনিত সংকটাপন্ন একটি হিন্দু পরিবারের অসহায়তা, উৎকণ্ঠা আর উদ্বেগভরা কাহিনি গল্পটিতে বিধৃত। একই সঙ্গে খাঁচা থেকে বেরিয়ে একটি মুক্তজীবন প্রত্যাশার স্বপ্নও এতে প্রোথিত আছে। অম্বুজাক্ষ দেশভাগের পরে তিন বছর ধরে চেষ্টা-তদবির করছে বাড়িঘর ও সম্পত্তি বিনিময় করে এপার থেকে ওপারে যেতে। কিন্তু বারবার ব্যর্থ হতে হচ্ছে অম্বুজাক্ষকে। খাঁচাসদৃশ পাকিস্তানে স্ত্রী সরোজিনী বদ্ধ থাকলেও স্বপ্ন দেখে নতুন দেশের, নতুন জীবনের। কিন্তু চারদিক সবকিছু স্থবির হয়ে যাচ্ছে। ছেলেরা দিন দিন

বখাটে হয়ে উঠছে। বয়স্ক বাবা পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন। জীবনটা হয়ে উঠেছে দুর্বিষহ। তবুও নিজ দেশের প্রতি অম্বুজাক্ষর একটা টান। বিষাদ ভারাক্রান্ত ব্যর্থ অম্বুজাক্ষ শেষমেশ স্ত্রীকে বলে দেয়, 'যাওয়া আর গেল না আর কি। সব গোলমাল হয়ে গেল। গিয়েই বা লাভ কি বলো? একই কথা, খবরাখবর যা পাচ্ছি তাতে মনে হয় এখানে তবু খেতে পাচ্ছি দু মুঠো—সেখানে লোকজন শুকিয়ে মরে যাচ্ছে।' কিন্তু তা শুনে সরোজিনী তো পাথর। অম্বুজাক্ষ বিশ বছর পর আত্মিক অবলম্বন হিসেবে সেতার হাতে তুলে নেয়—দেশরাগে ডুবে যায়। কিন্তু সরোজিনী তা সইবে কেন? খাঁচার ভেতরে মাথা ঠোকরাতে ঠোকরাতে সে তো পাগলিনী। তাই ক্ষেপে ওঠে সে। সহসা লাঠি দিয়ে সেতার ও হারিকেন চুরমার করে ফেলে। এগিয়ে যায় অম্বুজাক্ষের দিকে। সরোজিনীর সামনে শেষে অম্বুজাক্ষের আর্তচিৎকার, 'সরোজিনী আমাকে নয়, আমি নই।' আসলেই খাঁচা ভেঙে বেরিয়ে আসতে না পারার দায়ভার অম্বুজাক্ষের নয়, খাঁচাটি সে নিজে তৈরিও করেনি—সে পরিস্থিতির শিকার। তাকে কেউ সুকৌশলে খাঁচার ভেতরে ঢুকিয়ে দিয়েছে। এখান থেকে বেরুবার পথ অম্বুজাক্ষদের মতো ভাগ্যবিড়ম্বিত মানুষের জানা নেই। গল্পটিতে গোটা পাকিস্তানই একটি বদ্ধ খাঁচার প্রতীকে মূর্ত হয়ে উঠেছে।

এভাবে দেখতে পাই দাঙ্গা, দেশভাগ ও বাস্তুত্যাগ লক্ষ লক্ষ মানুষকে যে-বিপন্নতায় ঠেলে দিয়েছিল হাসানের গল্প তারই এক বহুরৈখিক শিল্পভাষ্য হয়ে উঠেছে। ভারতবিভাগ সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান করতে পারে নি। অন্যদিকে দেশভাগ ও স্বাধীনতা হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক বিভাজনের বিষহরণ না করে সমাজদেহে সেই দূষণ আরও ব্যাপক ও স্থায়ী করে তুলেছিল। আর ফল হিসেবে অগণিত মানুষকে হতে হলো এর নির্মম বলি ও লাঞ্ছনার শিকার। অথচ ইতিহাসের ট্রাজিক উল্লাসে চাপা পড়েছে মানুষ ও মানবতার সেই আর্তস্বর ও কান্না। হাসান তাঁর গল্পে ভেস্তে-যাওয়া ও নেতিয়ে-পড়া সেইসব মানুষের চাপা কান্না শুনিয়েছেন রক্তক্ষরা বোধ ও অন্তরঙ্গ ভাষার বুননে। হাসানের পক্ষে এটা সম্ভব ছিল এজন্য যে, তিনি নিজেও ছিলেন সেই দাঙ্গাপীড়িত, দেশভাগ ও দেশত্যাগের শিকার ছিন্নমূল এক ট্রাজিক চরিত্র। তা সত্ত্বেও, রবীন্দ্রনাথের মতোই তিনি মানুষের অপরাভবতা ও সীমাহীন সম্ভাবনায় গভীর আস্থাশীল। অন্তত পোড়খাওয়া ও কাটাছেঁড়া জীবন থেকেই তার এই শিক্ষা। হাসানের আত্মজবানিতে, 'বাস্তবে আমি আজ এক দুমড়ানো-মুচড়ানো মানুষ। মনে হয় আমার মতোই হয়তো সবাই তাই। তবু এটাই শেষ কথা নয়। শেষ কথা হতে পারে না। শুধুমাত্র নিজের দিকে তাকাই বলেই একথা মনে হয়। মানুষের উত্থানকে কে কবে ঠেকাতে পেরেছে?'

গ্রন্থপঞ্জি

অশ্রুকুমার শিকদার, ২০০৮। 'ভাঙা বাংলার সাহিত্য', *দেশভাগ, স্মৃতি আর স্তব্ধতা*, সম্পাদনা : সেমন্তী ঘোষ, গাঙচিল, কলকাতা।

আবু জাফর, ১৯৯৬। *হাসান আজিজুল হকের গল্পের সমাজবাস্তবতা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

উর্বশী বুটালিয়া, ১৯৯৮। *দ্য আদার সাইড অব সাইলেন্স : ভয়েস ফ্রম দ্য পার্টিশন*, পেঙ্গুইন, নিউ দিল্লি।

দেবেশ রায়, ১৯৯৯। 'পুরাণ থেকে পুরাণ', *রক্তমণির হারে*, সাহিত্য আকাদেমি, নয়া দিল্লি।

পাউল সেলান, ১৯৯৭। *পাউল সেলানের কবিতা* (ভূমিকা ও অনুবাদ : খোন্দকার আশরাফ হোসেন), বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

মফিদুল হক, ২০০৯। 'দেশভাগ : আমাদের বিষবৃক্ষ', *দেশভাগ, সাম্প্রদায়িকতা এবং সম্প্রীতির সাধনা*, ইউপিএল, ঢাকা।

মিহির সেনগুপ্ত, ২০০৬। 'বিষাদবৃক্ষ', *উজানি খালের সোঁতা*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা।

সেমন্তী ঘোষ, ২০০৮। 'দেশভাগের ইতিহাস আর স্মৃতি বিস্মৃতি', *দেশভাগ, স্মৃতি আর স্তব্ধতা* (সম্পাদনা), গাঙচিল, কলকাতা।

হাসান আজিজুল হক, ১৯৯৪। 'দুই যুগের দেশমানুষের কথা', *কথাসাহিত্যের কথকতা*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা।

হাসান আজিজুল হক, ২০০২। 'মানুষের জীবনযাপন : সাম্প্রদায়িকতা, দেশভাগ, দাঙ্গা', *দেশে বাংলাদেশে*, সম্পাদনা : অরুণ সেন/শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ও নয়া উদ্যোগ, কলকাতা।